পাণ্ডুলিপির

সমগ্র কবিতা

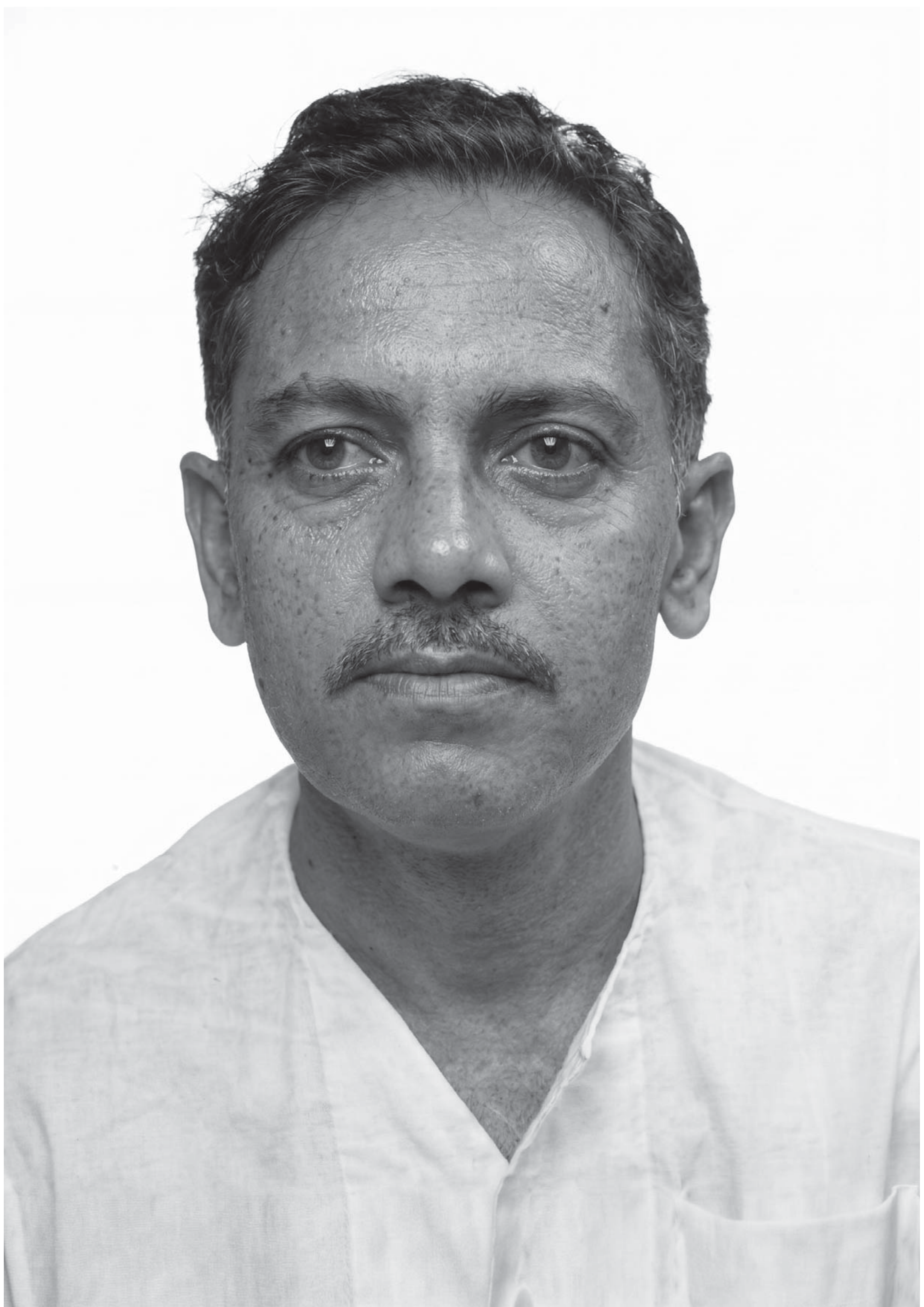

পাণ্ডুলিপির
সমগ্র কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

সম্পাদনা
গৌতম মিত্র

প্রকাশ

PANDULIPIR SAMAGRA KOBITA

A collection of Poems

by Jibanananda Das

Edited by Gautam Mitra

First Published
January, 2026

ISBN 978-81-7332-397-3

Price r 950

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র

দাম r ৯৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা -৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান কবিদের ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারি তাঁরা সারাজীবনে ঠিক কটি কবিতা লিখেছেন। অথচ জীবনানন্দ দাশের মতো আন্তর্জাতিক মানের একজন কবির ক্ষেত্রে আমরা আজও বলে উঠতে পারিনি, সারাজীবনে তিনি ঠিক কটি কবিতা লিখেছেন। এটা একটা জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্য বৈকি। যদিও জীবৎকালে তিনি ১৬২ টি কবিতা গ্রন্থভুক্ত ও ২০০ টির মতো কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যতদিন যাচ্ছে তত তাঁর কবিতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমনকি এই ২০২৬-এও তাঁর প্রায় ১৪০ টি অপ্রকাশিত কবিতা আলোর মুখ দেখবে। জীবনানন্দ আমাদের কাছে এক ঘোর বিস্ময়। অপার রহস্যে ঘেরা একজন চিন্তক। হ্যাঁ, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ডায়েরির জীবনানন্দ থেকে আমার কাছে তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি একজন ভাবুক। তিনি একজন আঁভ-গার্দ লেখক বা অগ্রদূত। ভবিষ্যৎ দেখতে পান। ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেন। স্বপ্ন দেখতে শেখান।

শুরুর আগের একটা শুরু থাকে। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর গল্প। জীবনানন্দ নিয়ে কমবয়স থেকে আগ্রহ থাকলেও সত্যিকারের চর্চা শুরু ভূমেন্দ্র গুহর সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে। তার ছয়-সাত বছর আগে অবশ্য গবেষক কল্যাণকুমার বসুর সঙ্গে জীবনানন্দ নিয়ে আলোচনায় দিনের পর দিন কেটেছে। কল্যাণকুমার বসু কাজ শুরু করেছিলেন ক্লিন্টন সিলির সঙ্গে ১৯৬৬-৬৭ থেকে।

তো কীভাবে পরিচয় ভূমেন্দ্র গুহর সঙ্গে? তখন সবে 'বিভাব' পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। অক্টোবর মাস। সংখ্যাটা হাতে পেয়ে একটা ঘোর-লাগা ভাব। পাগল-খ্যাপা অবস্থা। সেটা ১৯৯৮। দিনরাত 'বিভাব'-এর সংখ্যাটা নিয়ে যাকে বলে ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস। এমন একটা সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা কবি অনির্বাণ (ধরিত্রীপুত্র) দার ফোন। ভূমেন্দ্র গুহ জীবনানন্দর ডায়েরি উদ্ধারের কাজে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে খুঁজছেন,

যদি আমি দেখা করি। আসলে অনির্বাণদা আমার জীবনানন্দ ও কমলকুমারের প্রতি ভালোবাসার কথাটা কিছুটা হলেও জানতেন। অনির্বাণদার জীবনদীপ বিল্ডিং-এর অফিসে আমাদের মধ্যে জীবনানন্দ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মাঝখানে কমন একজন প্রিয় মানুষ ছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, যাঁর কমলকুমার ও জীবনানন্দ নিয়ে কাজ প্রায় প্রবাদপ্রতিম। এবং আজকে আমার যতটুকু যা সামান্য লেখালেখি, তার নেপথ্যে রক্ষিত স্যারের ভূমিকা সবচাইতে বেশি। আমি তো প্রস্তাবটি শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ভূমেন্দ্র গুহ তখন প্রায় মিথ। 'দরগা রোড' কাগজ করেন, রাতভর আড্ডা বসে দরগা রোডের বাড়িতে। রথী-মহারথীরা সেই আড্ডা আলোকিত করেন। তা ছাড়া সদ্যপ্রকাশিত 'বিভাব' তো আমার হাতে। কাকে বলে সম্পাদনা, চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিয়েছেন। তো একদিন গুটিশুটি গিয়ে হাজির হলাম দরগা রোডের বাড়িতে। তখন প্রায় সন্ধ্যা ৭.৩০। জীবনে সেদিন অনেক কিছু প্রথম দেখলাম। পাজামা-ফতুয়া পরা ডাক্তার, বাংলাতে প্রেসক্রিপশন-লেখা ডাক্তার, রোগীর সঙ্গে খেজুরে গল্প জুড়ে দেওয়া ডাক্তার। তো বসেই আছি, সমস্ত রোগী চলে যাওয়ার পর আমার ডাক এল। দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে বসলাম সামনের চেয়ারে। আমাকে যেন প্রায় দেখলেনই না, বা দেখেও পোকামাকড় জ্ঞান করলেন। ঠিক বাঁ হাতে কিছু নামের লিস্টের একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, দেখুন উদ্ধার করতে পারেন কিনা।

বাড়ি ফিরে এসে কেমন একটা রোখ চেপে গেল, (পরে শুনেছি এই লিস্টটা অনেক হাতফেরতা হয়ে আমার কাছে এসেছিল)। লাইব্রেরিপ্রীতিটা আমার আগে থেকেই ছিল। বইপত্রও ছিল সামান্য। তো এক সপ্তাহ আদা-জল খেয়ে লেগে পড়লাম। এবং ২/৩ টি ছাড়া প্রায় সবকটি উদ্ধারও করেও ফেললাম। সেই শুরু। আর কোনও চৌকাঠ পেরোনো নয়, একেবারে সটান মানুষটার হৃদয়ে প্রবেশ করলাম। অতঃপর পরবর্তী ১০ টা বছর এমন কোনও দিন মনে পড়ে না, আমাদের দেখা হয়নি বা ফোনে কথা হয়নি। শুধু আমি নয়, আমার পরিবার ও ভূমেন্দ্র গুহর পরিবারও কাছাকাছি হলাম। সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। অন্য প্রসঙ্গ।

জীবনানন্দের কবিতা সম্পাদনার সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে পড়লাম তার গল্পটা এইরকম। নিজের হাতে একটি কাব্যগ্রন্থের সূচিপত্র তৈরি করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। নামও ঠিক করেছিলেন। ‘‘শীতসবিতা’’। কিন্তু কবিতাগুলি ছিল না খাতায়। কবিতা সংগ্রহের কাজটা যখন বরাতে জুটে গেল, কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি। অনেক কবিতা সংগৃহীত হলেও কোথাও যেন হিসাবের একটা গোলমাল হচ্ছিল। কিছু কবিতা কোনও সূত্রেই পাওয়া যাচ্ছিল না। জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপির কথা জানতাম। ভাবলাম সেই পাণ্ডুলিপিও একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে সম্মতি মিলল কবিতার সেই ৪৮টি খাতা দেখবার। নিয়মানুসারে মাইক্রোফিল্মে দেখার কথা সেই কবিতা। আমি কয়েকটি মূল খাতা দেখার বাড়তি সুযোগও পেয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে আমার সামনে যেন এক রহস্যের দ্বার খুলে যাচ্ছিল। পাণ্ডুলিপির ভবনের সেই হিমশীতল ঘরটি আমার কাছে প্যান্ডোরার বাক্সা হয়ে উঠল। এক একটি খাতার প্রতিটি কবিতার প্রথম লাইন লিখে নিয়ে বাড়ি ফিরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। কাজটি যেদিন শেষ হল বিমূঢ় বিস্ময়ে আমি আবিষ্কার করলাম প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা আজও অপ্রকাশিত।

জাতীয় গ্রন্থাগারে কবিতার সংখ্যা ২১৫২ আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা তখন অবধি ৫৯৯। অর্থাৎ সেই ২০০২ সালে জন্মশতবর্ষ পার হয়েও জীবনানন্দ দাশের মতো একজন প্রধান কবির অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যা কমপক্ষে ১৫৫৩। মৃত্যুর পরেও ভাগ্য কবির অনুকূল হয়নি। কপিরাইট নামের এক অদৃশ্য সুতোর টানে বারবার পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত রচনা প্রকাশের পথ। একটি ট্রাংক তিনি আজীবন বুকের পাঁজর দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বরিশাল ছেড়ে স্থায়ীভাবে যখন কলকাতায় এলেন, অনেক মূল্যবান সামগ্রী ফেলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু এই ট্রাংকটি জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর সঙ্গী ছিল। অনেকেই একটি পরিচিত দৃশ্যের কথা বলেছেন। কবি ট্রাংকটি খুলে বসে সমস্ত কাগজপত্র বার করে নিবিষ্ট হয়ে কী যেন দেখছেন। কেউ এলেই চকিতে তা আড়াল করছেন। কী ছিল এই ট্রাংকে। প্রায় আড়াই হাজার কবিতার পান্ডুলিপি, ১৯ টি উপন্যাস, ১২৭টি গল্প, ৭৮টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ব্যক্তিগত রচনা আর ৫৬টি খাতাভর্তি প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার ‘‘লিটারারি নোটস’’ নামাঙ্কিত ডায়রিধর্মী রচনা। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা প্রায় শতাধিক চিঠির প্রতিলিপি। অথচ জীবিতকালে কবির গ্রন্থসংখ্যা ৬। এই পাণ্ডুলিপির জন্যেই বারবার আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন আর সফলতা থেকে নিষ্ফলতার দিকে ছুটে গেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি, জীবনানন্দ দাশ কবিতা লেখার সময় কোনও তারিখ লিখে রাখতেন না। পাণ্ডুলিপির খাতার শুরুতে আমরা যে কালের উল্লেখ পাই তা কবিতাগুলি প্রতিলিপি করার সময়ের। তবে সাধারণত কালানুক্রমিকভাবেই পান্ডুলিপিতে কবিতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের খাতাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে গিয়ে একটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট হল যে জীবনানন্দ দাশের কবিতা এই পাণ্ডুলিপির ৪৮টি খাতার বাইরেও কোথাও রয়ে গেছে। এর কারণ দু’টি। এক, প্রকাশিত অনেক কবিতার পাণ্ডুলিপি এই ৪৮টি খাতায় নেই। দুই, কোনও কোনও খাতার সময়কালের মধ্যে অনেক সময় বিস্তর ব্যবধান। বিভিন্ন সূত্রে এ-ও জানতে পারি কবিকন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ অনেক খাতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

তো আর একটি কাজও এতদিনে জুটে গিয়েছিল। জীবনানন্দ দাশের ‘‘লিটারারি নোটস’’-এর ভিন্ন এন্ট্রি উদ্ধারের কাজ। আমার দিনগুলি তখন জাতীয় গ্রন্থাগার আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভাগ করে নিয়েছিল। আর তারই মধ্যে বরিশালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও ব্যক্তির সন্ধান পেলেই সেখানে ছুটে যাওয়া। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র ‘‘ব্রহ্মবাদী পত্রিকা’’র অনেকগুলি সংখ্যা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। এই পত্রিকাতেই জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশ। ডায়রিতে উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার তথ্য এই পত্রিকাটি থেকেই উদ্ধার করি। আর জাতীয় গ্রন্থাগারে দৈনিক পত্রিকা বিভাগ আমাকে সাহায্য করেছিল অন্যভাবে। যে বিজ্ঞাপন দেখে কবি চাকরির জন্য দরখাস্ত করছেন বা জন্য দাঁতের মলম কিনবেন বলে ভাবছেন সেই ধরনের অনেক বিষয় যাচাই করে নিতাম সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকা থেকে। এই রেফারেন্স জরুরি ছিল কারণ এরপরই জীবনানন্দ সটান জেমস জয়েসের ‘‘ইউলিসিস’’-এর নায়িকা মলি সঙ্গে স্ত্রী লাবণ্যর তুলনামূলক আলোচনায় পাতা ভরাবেন। আমাদের মনে পড়বে জয়েসের স্ত্রী (যদিও বিবাহ সম্পর্কের ২৭

বছর পর, ইউলিসিস প্রকাশের ৯ বছর পর) নোরার ছায়াও তো মলির চরিত্রে তির্যকভাবে পড়েছে।

এক সহৃদয় মহিলা যে মঞ্জুশ্রী দাশের গচ্ছিত রাখা পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিল রক্ষা করেছেন এবং তা অশোকানন্দ দাশের পুত্র অমিতানন্দ দাশকে যথাসময়ে ফিরিয়েও দিয়েছেন তা জানতাম। কিন্তু মহিলার পরিচয় জানা ছিল না। জীবনানন্দ দাশের ডায়রিতে অশোক নামটি পাই। এই অশোক যে বন্ধুস্থানীয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। 'ব্রহ্মবাদী পত্রিকা'র একটি খবর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯ বৈশাখ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাশের তৃতীয় কন্যা সলিলার সঙ্গে বরিশালের ব্রাহ্মবন্ধু বিনয়ভূষণ গুপ্তের পুত্র অশোকচন্দ্রের শুভ বিবাহ। তৎক্ষণাৎ ডায়রির এন্ট্রি 'Benoy Gupta's son পুত্রবধূ'-র সমাধানসূত্র খুঁজে পাই। আরও জানতে পারি তিন ভাই নলিনীভূষণ গুপ্ত (১৮৭০-১৯৩০), বিনয়ভূষণ গুপ্ত ও ইন্দুভূষণ গুপ্তের সঙ্গে দাশ পরিবারের হৃদ্যতার কথা। সর্বানন্দ দাশের মৃত্যুর পর দাশ পরিবারকে অকৃতদার ব্যারিস্টার নলিনীভূষণ গুপ্ত নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

আমার খোঁজ শুরু হল। যদি অশোকচন্দ্র গুপ্তের কোনও উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তখন এক ঘোরলাগা অবস্থা। কোনোদিন জীবনানন্দ দাশের দিদি অমিতার পুত্রের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি, কখনও বা মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশের কোনও বংশধরের। কাকা অতুলানন্দ দাশের বড়ো মেয়ে জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত, মেজো মেয়ে শোভনা মজুমদারের বাড়ি ঘনঘন যাচ্ছি। কখনও ডানলপ, কখনও বাঁশদ্রোণী, কখনও বা রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ''লিটারারি নোটস''-এর এন্ট্রি 'Alicia's Diary' আবিষ্কার করে চমকে উঠছি। একমাথা ঝড় বয়ে ফুলরেণু গুহ'র সাক্ষাৎকার নিয়ে ফিরছি। এমনই কোনও এক চলাচলের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি সেই সহৃদয় মহিলাটির কথা। অশোকচন্দ্র গুপ্তর কন্যা শ্রীমতী রত্না রায়। এক গোধূলিবেলায় হাজির হলাম শ্রীমতী রায়ের বাড়িতে, ঝোলায় নিয়ে শ্রীমতী রায়ের বাবা মা'র বিবাহের খবর সম্বলিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকাটির কপি। আজও সেই হাসিমুখটি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাই। কী যে খুশি হয়েছিলেন সেদিন তার সাক্ষী শুধু আমি। নানান কথায় জানান, প্রাণে ধরে জীবনানন্দ দাশের কিছু খাতা তিনি কাউকে দিতে পারেননি, এর সঙ্গে তার যে প্রাণের যোগ। মঞ্জুশ্রী দাশের নানা খামখেয়ালিপনার কথাও বললেন। কর্মসূত্রে যখন দিল্লি বা বোম্বেতে গেছেন শ্রীমতী রায় মঞ্জুশ্রী গিয়ে হাজির হয়েছেন সেখানেও। শুধুমাত্র বরিশালের কথা শোনার আগ্রহে আমার যাতায়াত শুরু হল শ্রীমতী রায়ের বাড়িতে। একদিন কথায় কথায় আবার খাতাগুলির প্রসঙ্গ উঠল। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খাতাগুলি নিয়ে এলেন। আমি জীবনানন্দকে নিয়ে কাজ করছি জেনে খাতাগুলি আমার হাতে তুলে দিলেন। এই খাতাগুলোর কবিতা বলাই বাহুল্য জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই। এভাবে গত ২৫ বছর ধরে জীবনানন্দ দাশের লেখার সঙ্গে কীভাবে যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো মিশে গেলাম।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, যেদিন প্রথম ভূমেন্দ্র গুহকে প্রায় দেড়হাজার অপ্রকাশিত কবিতার সন্ধান দিই, করুণাময়ীর রাস্তার স্বল্প আলোয় আমাকে তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমার বাবার বয়সী ছিলেন মানুষটা, আমাকে পুত্রস্নেহ করতেন। একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'গৌতম তাঁর স্বাভাবিক ভালোবাসার প্রবণতার বশে এখন আমার ক্রাচ হয়ে আছেন নিজেই।' আজ এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে তাই খুব বেশি মনে পড়ছে ভূমেন্দ্র গুহর কথা।

আমাদের জানতে ইচ্ছে করে ঠিক কী ঘটেছিল বাংলা ভাষার এই প্রধান কবির ক্ষেত্রে যার জন্য মৃত্যুর ৭২ বছর পরেও আজও একটি 'সমগ্র' রচনার জন্য প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে? এর ইতিহাসটা অনেকে জানলেও ঠিকমতো আলোচনা হয়নি। এটা একটা জাতির পক্ষে লজ্জারও বটে। কখনও পারিবারিক গোলযোগে, কখনও প্রকাশকের কপিরাইট নামক হুমকি, আবার কখনও অবহেলায় তার খাতা হারিয়ে ফেলা— তা সে যাই হোক না আমাদের নাগালের বাইরে এতদিন তাঁর 'সমগ্র' রচনা রয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেউ আবার অভিযোগের আঙুল তোলেন এই বলে যে কবি জীবদ্দশায় যা তিনি প্রকাশ করে যাননি তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন। তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই পৃথিবীর অনেক যুগান্তকারী গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে বাতিল করা কাগজ কুড়িয়ে। জীবিতকালে ভিটগেনস্টাইনের বই মাত্র ১ টি, তাও মাত্র পঁচাত্তর পাতার। মৃত্যুর পর তারই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০০০০। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ একজন দার্শনিক হিসেবে মানা হয়। কাফকা তাঁর বিখ্যাত লেখাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। আর একটা কথাও কি তারা একবার ভেবে দেখেন না, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, খাতার পর খাতা ধরে কবি কেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত অবধি কবিতাগুলো কপি করে রেখেছিলেন। আর শুধু কপি করা তো নয় বুকের পাঁজর দিয়ে আজীবন রক্ষাও করেছেন সেসব। বরিশাল থেকে চলে আসার সময় অনেক কিছুই ফেলে আসতে হয়েছিল কিন্তু পাণ্ডুলিপির ট্রাঙ্কটিকে তিনি ফেলে আসেননি। কেউ যখন কবিতা চেয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য মতে এই খাতাগুলো থেকেই তো তিনি কপি করে দিয়েছেন। ''বনলতা সেন'' কবিতাটি যে খাতা থেকে দিয়েছেন (যদিও ব্লেড দিয়ে পৃষ্টাটি কাটা) তার আগে ও পরের কবিতাগুলি কি সমালোচকের এতটা চোখ রাঙানির যোগ্য? আসলে অক্ষম পিচুটিতে আজও আমাদের দুচোখ ভরে রয়েছে।

আমরা যখন কাজ শুরু করেছি তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। মৃত্যুর পরপরই কাজটা শুরু করতে পারলে অনেক খাতা হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেত। দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় ''জীবনানন্দ সমগ্র'' আমাদের বিস্ময়। কিন্তু অবাক লাগে প্রথমদিকে কয়েকটি কবিতা সংকলিত হলেও প্রধানত গল্প উপন্যাসের মধ্যেই জীবনানন্দ সমগ্র সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ' একক কোনও ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয় কাজ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কবিতা তিনি যেভাবে একজায়গায় জড়ো করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। সবসময় মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই হয়তো কিছু কিছু কবিতায় শব্দে ভুল থেকে গেছে বা আংশিক ছাপা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এঁদের অগোচরে থেকে না গেলে আজ অন্যরকম ইতিহাস সৃষ্টি হত। ভবিষ্যতে জীবনানন্দকে নিয়ে গবেষণার পথ এঁরা অনেকটাই খুলে দিয়েছেন।

এছাড়া মৃত্যুর পর জীবনানন্দ দাশের কবিতা সংকলনের মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হল

১. রূপসী বাংলা, ১৯৫৭ (প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত)
২. বেলা অবেলা কালবেলা, ১৯৬১(প্রকাশক অশোকানন্দ দাশ)
৩. সুদর্শনা, ১৯৭৩ (প্রকাশক গোপালচন্দ্র রায়)

৪. জীবনানন্দ দাশের কবিতা, ১৯৭৪ (সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ)
৫. মনবিহঙ্গম, ১৯৭৯ (প্রকাশক ময়ূখ বসু)
৬. আলোপৃথিবী, ১৯৭৯ (ভূমিকা অশোকানন্দ দাশ)
৭. হে প্রেম, তোমারে ভেবে ভেবে, ১৯৯৮ (প্রকাশক প্রিয়ব্রত দেব)
৮. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার, ১৯৬৯ ও ১৯৮২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), (সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত)
৯. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয়, ১৯৭০ ও ১৯৭১ (প্রকাশক ময়ূখ বসু)
১০. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ১৯৯৩ (সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)
১১. ছায়া আবছায়া, ২০০৪ (সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ ও গৌতম মিত্র)
১২. পাণ্ডুলিপির কবিতা ১-১৪ খণ্ড, ২০০৫-২০১৪ (সম্পাদক প্রথম খণ্ড ভূমেন্দ্র গুহ ও গৌতম মিত্র, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ খণ্ড সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ, সম্পাদনা সহযোগিতা গৌতম মিত্র, সপ্তম থেকে চতুর্দশ খণ্ড সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ)
১৩. অপ্রকাশিত জীবনানন্দ ১ ও ২, ২০১৫ ও ২০১৬ (সম্পাদক গৌতম মিত্র)
১৪. শীতসবিতা, ২০১৯ (সম্পাদক গৌতম মিত্র)
১৫. আলো আঁধারের জার্নাল, ২০২২ (সম্পাদক গৌতম মিত্র)
১৬. জ্যোতিতিমির, ২০২৫ (সম্পাদক গৌতম মিত্র)
১৭. ইতিহাসযান, প্রকাশিতব্য ২০২৬ (সম্পাদক গৌতম মিত্র)

এর বাইরে দুই বাংলায় বিভিন্ন নামে অসংখ্য কবিতা সংকলন হয়েছে কিন্তু তার কোনওটাই মৌলিক নয়। ওপরের বইগুলো থেকে কবিতা নিয়ে সেই সংকলনগুলো তৈরি হয়েছে তাই সেগুলোর উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।

আমরা যদি জীবনানন্দ দাশের জীবিতকালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি লক্ষ্য করি, একটি প্রবণতা দেখে অবাক হই। কী সেই প্রবণতা? একমাত্র 'ঝরা পালক' বাদ দিয়ে, অন্য কাব্যগ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় জীবনানন্দ অন্তত ৫ বছরের পুরোনো কবিতা বেছে নিচ্ছেন। যেমন ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে স্থান পাচ্ছে বোধ (১৯২৯), পরস্পর (১৯২৮), পিপাসার গান (১৯২৭), নির্জন স্বাক্ষর (১৯২৯)। ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'বনলতা সেন'-এ জায়গা করে নিচ্ছে সাত বছর আগে লেখা কবিতা বনলতা সেন, ঘাস, হায় চিল, কুড়ি বছর পরে ইত্যাদি কবিতা। এর দু'টি কারণ হতে পারে। এক, কবিতাগুলো ফেলে রেখে তিনি দেখতে চেয়েছেন, সময়ের আততি ও ভর কবিতাগুলো বহন করতে পারে কিনা। দুই, সময়মতো প্রকাশক না পাওয়া। দ্বিতীয় কারণটি যুক্তিসংগত নয় কেননা একটি বা দুটি কাব্যগ্রন্থ বাদ দিলে, বাকি বইগুলোর প্রকাশক স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ। হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রকাশকের নাম লেখা থাকলেও, এটাই বাস্তব। আসলে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সময়কাল জীবনানন্দ দাশের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। খুব সচেতনভাবে লেখালেখির একটা প্রজেক্ট তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। যে দু'টি পর্বে আমরা জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টির উদ্গীরণ লক্ষ করি তার একটি এই সময়কাল। খুব সুপরিকল্পিতভাবে এই সময় তিনি কোনও নির্দিষ্ট চাকরি করছেন না, একটি বা দু'টি বাদে কোনও কবিতা প্রকাশ করছেন না, কোনও সভাসমিতি সাহিত্য আড্ডায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কী করছেন? মুখ গুঁজে শুধু পড়ছেন, ভাবছেন

ও লিখছেন। আর কলকাতা বরিশালের পথে মাঠে হাটে ঘাটে ভবঘুরের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছেন। বেশিরভাগ সময় কলকাতার প্রেসিডেন্সি বোর্ডিঙে প্রায় না-থাকার মতো করে ঝুলে আছেন। বরিশাল ফিরলে বৌয়ের গঞ্জনা, বাবার আকুতি ও মায়ের উৎকণ্ঠা। রোগা লিকলিকে মেয়েটির জন্য প্রাণ কাঁদে। অথচ একটি লজেন্স বা বিসকুট কিনে দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। মাস গেলে ছোটো ভাই ভেবলু টাকা পাঠায়, তাতে মেসখরচ কোনওভাবে চলে, এক নয়া পয়সার চা-ও তো জোটে না। ঘড়ি ও ছেঁড়া জুতো সারাবার টাকা অবধি নেই।

তবু লিখে চলেছেন। রাশি রাশি সেই লেখা। সারাজীবনে যা গদ্য লিখবেন তার সিংহভাগই তো এই পর্বে লেখা। ১২৭টি গল্পের নব্বই শতাংশ ও ৫ টি বাদ দিয়ে ১৯টি উপন্যাসের বাকি সবগুলো তো এই সময়েই লেখা। বিশেষত ১৯৩২-৩৩-এ। এটি কি প্রজেক্ট নয়। কবিতাতেও তো আমরা প্রায় একই জিনিস লক্ষ্য করি। ১৯৫০-এর পর জীবনানন্দ যেন বড়ো বেশি শিথিল, ম্লান ও শ্লথ। কোনও গল্প উপন্যাস আর লিখছেন না। ১৯৫২-৫৩-তে কেউ কবিতা চাইতে আসলে, বিভিন্নজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি পুরোনো একটি কবিতা বেছে নিচ্ছেন বা দু'তিনটি কবিতা থেকে একটি কবিতা নির্মাণ করে দিচ্ছেন। তাঁর প্রেরণার জায়গাটি কি তবে ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছিল!

সেই প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয় তবে শেষ পর্যায়ের কবিতায় আমরা একটি পরিবর্তন লক্ষ করি। বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমলেন্দু বসু, অরুণকুমার সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য ও শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় অবধি জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে যে মূল্যবান আলোচনা দেখি তা কবির ২৫০০ কবিতার মধ্যে বড়জোর ৫০০ কবিতা নিয়ে। ১৯৮১-তে প্রকাশিত 'আলোপৃথিবী' অবধি জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ৪৩৮। শিবাজীবাবুর 'প্রসঙ্গ জীবনানন্দ' বইটিও ১৯৮১-তে প্রকাশিত।

অরুণকুমার সরকার জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। ১. মনোময় জগৎ, ২. কর্মময় জগৎ, ৩. নবতর উৎসাহের মনোময় জগৎ। অর্থাৎ মনোময় থেকে নবতর মনোময় জগতে ফিরে আসা। আমরা এই ২০২৬-এ পৌঁছে জীবনানন্দকে আর এত সহজে মূল্যায়ন করব না। কেননা আমাদের সমানে পাণ্ডুলিপির জাদুবাক্স একে একে খুলে যাচ্ছে। হাজার বিচ্ছুরণ তার, হাজার রূপকথা ও হাজার ভাঙাচোরা আয়না। আমরা ক্রমশ বুঝতে পারি, গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ ডায়েরি ও জীবন জীবনানন্দ দাশের কাছে একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ। জীবনানন্দের পরীক্ষাগারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গিনিপিগটির নাম শ্রীজীবনানন্দ দাশ। নিজেকে নিয়ে এত এক্সপেরিমেন্ট খুব কম কবিই করেছেন। আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দ দাশের যাত্রা তাঁর 'আমি'-কে 'অপর' করে তোলার পথ ধরে। যেভাবে 'কারুবাসনা'-র ফার্স্টপার্সন কথক 'মাল্যবান'-এ এসে 'অপর' হয়ে যায় বা 'প্রেতিনীর রূপকথা'র আমি 'সুতীর্থ'-এ এসে তুমি হয়ে ওঠে, ঠিক সেভাবে জীবনানন্দ দাশের কবিতার 'আমি' ক্রমশ দ্রুত সোমনাথ সেন, জোড়া হালদার, বিমল দালাল, চারু ঘোষাল, নিমাইচরণ সান্যাল নামের 'অপর' বা জীবনানন্দেরই অলটার ইগো হয়ে উঠতে থাকে। বোদল্যের 'কেলাসিত আত্মন'-এর কথা বলেছিলেন, নিটশে বলেছিলেন 'farthest' আমির কথা, র‍্যাঁবো বলেছিলেন 'I is another', কিয়ের্কেগার্দ বলেছিলেন হাসি ও কান্নার দুই মুখের কথা আর রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এ আমির আবরণ তাঁকে ঘিরে আছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা এক

(egoism) থেকে বহু (altruism) হওয়ার সাধনা। খুব সহজ নয় এই পথ। ধীরে ধীরে আমিত্বের মোড়ক খসাতে হয়। বর্জনের সেই পথ জটিলসুন্দর। সফলতা নয় নিষ্ফলতায় তাকে ছোঁয়া যায়। গতি নয় মন্থরতায় তাকে অনুভব করা যায়। একদিন জলের মতো ঘুরেঘুরে যে একা কথা কয়েছিল আজ সে হেগেল বিক্রি করতে এসেছে। দড়ি হাতে একা একা যে যুবকটি গলায় ফাঁস দিতে গিয়েছিল আজ সে বগি-গাড়ি তমাল-তলায় সারারাত ভিজেছে একাকী। ক্রমশ প্রিন্টারের শয়তান, কাগজের সম্পাদক, স্ট্রেচার, বেলুন জগৎ, নিমাইয়ের ঘোড়া, মুদির বাটখারা, পাদটীকা ও ঘড়ির কাঁচ কবিতার জায়গা করে নিচ্ছে।

২০২৬-এ জীবনানন্দ দাশের কবিতার কোনও সামগ্রিক সংকলন করতে গেলে এইসব কথা মনে রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে জীবনানন্দ ভাবতেন তিনি আর্টিস্ট। তিনি 'ছেদ ও বিচ্ছেদের' প্রাণধর্মে টিকে আছেন। হাইডেগারের মতো তিনি জানতেন, যখন ব্যক্তি মানুষ তার চূড়ান্ত সম্ভাবনাকে চরিতার্থ করবার জন্য অগ্রসর হয় তখনই সে তার স্বকীয় একাকিত্ব টের পায়। আর এই চরম সম্ভাবনা হ'ল ব্যক্তির মৃত্যু। কেননা মৃত্যুতেই ব্যক্তিজীবন পূর্ণতা পায়। মৃত্যুচেতনা নিয়ে উদ্বেগই সত্তার শূন্যতা। জীবনানন্দ দাশ ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না। একজন আর্টিস্টের মতো তিনি লেখেন, 'এই মশারির ছায়ার ভিতর প্রেম নয়, কামনা নয়, শক্তির আনন্দ নয়, প্রতিভার গৌরব নয়, অনেক দিন থেকে, করুণা আমার ঘরের ভিতর বাসা বেঁধে রয়েছে।' কবিতায় 'ছোটো বাবা'র কথা লিখেছেন। উপন্যাসে 'ছোটো অন্ধকার'-এর কথা। ডায়েরিতে 'minor' লিখে কলম থামিয়ে দিচ্ছেন। নিজেকে শুয়ারের ছেটানো নোংরা জলে ভিজে ভূত মানুষ ভাবছেন। পোঁদে তিনশো লাথ খাওয়া মানুষের স্বর তিনি চেনেন। শুধু অভিজ্ঞতায় আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। রিলকেকে নিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে যা বলছেন তা প্রণিধানযোগ্য:

'রিলকের এক-একটি কবিতা শুধু চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প, ভাবগুলো যেন থোকায় থোকায় ফুল হয়ে ফুটেছে, যেন পুরো কবিতাটাই আগ্নেয়গিরির মাথায় আগুনের আভা আর ধোঁয়ার কালিমা মিলে এক দারুণ বিস্ময়ের ও গভীর বেদনার সমারোহ, এমন এক জটিল বিশাল চিত্রকল্প যার ভেতর জড়িয়ে গেছে আরও অনেক সূক্ষ্ম চিত্রকল্প তাতে কবির সময়চেতনা, সমাজচেতনা, মানবচেতনা, সত্যচেতনা, কবির সংবেদ ও সংরাগ, যেগুলি নির্বস্তুক, যেগুলি দৃশ্যাতীত, যেগুলি শুদ্ধ বোধ, সেগুলি, সবগুলি শব্দের শরীর লাভ করে। উৎকৃষ্ট কবিতা আপন চিত্রকল্পের গর্ভে, বীজের আকারে, মহীরুহকে গোপন করে রাখে।'

'সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।' সারাজীবন জীবনানন্দ দাশ এই 'আড়চোখে' দেখে গেছেন সবকিছু। শ্লেষ, তির্যকতা ও রগড় তাঁর কবিতার পরতে পরতে। তিনি জানেন, 'নায়ক লেড়িকুত্তা হতে পারে; কুষ্ঠরুগি হতে পারে; কিম্বা অধিনায়ক, গণনায়ক, ল্যাঙ্গনায়ক অথবা পট্টনায়ক; যা খুশি হোক লেখকের কিছু আসে যায় না।' তিনি জানতেন, আমি যেমন 'অপর' নয়, আবার 'অপর' বাদ দিয়ে 'আমি'র অস্তিত্ব নেই। প্রতি মুহূর্তে তিনি এই 'আমি' ও 'অপর'-এর মধ্যে নিজেকে যাচাই করে দেখেছেন। মানুষের সনাতন রূপটি তিনি চিনতেন। 'পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।' বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সেই সম্পর্কিত বিবর্তিত ধ্যানধারণার বিষয়ে জীবনানন্দ দাশ সচেতন ছিলেন। তবে প্রায়োগিক বিজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানের 'অণ্ডকোষ ফেঁড়ে' যে জ্ঞান,

তাকে মানবিক অভিজ্ঞতার জগতে বাস করতে করতে, জীবনানন্দ একরকম ভাবে সন্দেহই করেছেন। 'বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা ক'রে ক্ষমতাশীল দেখ।' পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো—সুমের উর এশিরিয়া মিশর চীন জেরুজালেম গ্রীস-তাদের পুরাণ-ইতিহাসের পৃথিবীর প্রতি জীবনানন্দের আস্থা ছিল। তিনি জানতেন জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর বলে সে-সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ। পতঞ্জলি শ্বেতাশ্বতর জৈমিনি মৈত্রেয়ী চার্বাক ইশা ও নচিকেতা প্রতীকের মতো বারবার তাই তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরে এসেছে। 'আমাদের পৃথিবীর হে আদিম ঊষাপুরুষেরা,/তোমরা দাঁড়িয়েছিলে মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে;/কোথাও বিজ্ঞান, নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী/দৃষ্টিশক্তি, রয়ে গেছে....।' পৃথিবীর মৌল উপাদান-জন্ম, মৃত্যু, নক্ষত্র, অন্ধকার, রাত্রি, জল, আলো, ডিম, আগুন, বাতাস, মাটি-জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে চায়। 'অন্ধকার ও অনাদি নক্ষত্রের রূপ', 'আগুন, বাতাস, জল', 'নীল ডিম করেছ বুনন।' এই আমি 'নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে' জন্মায়। লক্ষণীয়, পথ বারবার ভুল হয় কখন? যখন 'আঘাত' ও 'দংশন' চায় মন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পাদনের সময় এই কথাগুলোও মনে রাখতে হবে।

এখন অবধি জীবনানন্দ দাশের যা কবিতা উদ্ধার করেছি তার সংখ্যা ২৫০৭। এই ২৫০৭ টি কবিতা তিনটি বা চারটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করব। এই প্রথম জীবনানন্দ দাশের সমস্ত কবিতা প্রকাশ হতে চলেছে। শেষ খণ্ডে অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত কবিতা সহ আমরা ২৫০৭ টি কবিতার যথাযথ সূত্র নির্দেশ করব। ওপরে উল্লেখিত ১৭ টি গ্রন্থ ও তার বাইরে কোন কবিতা কোথায় আছে তার বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। পাণ্ডুলিপির ৩ নম্বর খাতা থেকে ১৬ নম্বর খাতা অবধি এই খণ্ডে সংকলিত হল। কবিতার সংখ্যা ৭৭২। রচনার সময়কাল ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ অবধি। পাণ্ডুলিপির ২১৫২ টি কবিতা আমরা প্রথমে কালানুক্রমিক ভাবে প্রকাশ করব। তারপর বিভিন্ন সংকলনের কবিতাগুলো একে একে গ্রন্থিত হবে। যেমন ১৯৩২-এর আগে জীবনানন্দ দাশের কবিতার কোনও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। কিংবা ৪৭ টি খাতার বাইরের খাতাগুলোর কবিতা।

আমরা মান্য বানানরীতি গ্রহণ করেছি। যেমন 'সূর্য'-কে 'সূর্য্য' লেখার কোনও মানে হয় না। অবশ্য জীবনানন্দের স্বাক্ষর যেসব বানানে জড়িয়ে আছে যেমন ''অই'', আমরা পরিবর্তন করিনি। যতটা পেরেছি বিকল্প পাঠ উল্লেখ করেছি। তবে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার এক দুরূহ পথ। একমাত্র ভুক্তভোগীরাই তা জানেন। এমনও হয়েছে একটি শব্দের বিকল্প হিসেবে আটটি শব্দ লেখা হয়েছে। এই খণ্ডটি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি ভূমেন্দ্র গুহ ও 'প্রতিক্ষণ'-এর কাছে ঋণী। ভূমেন্দ্র গুহর সক্রিয় পরিশ্রম ও মেধা ছাড়া এই কাজ করা সম্ভবই ছিল না। এবং ভূমেন্দ্র গুহর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপির ৩৫ নম্বর খাতা থেকে ৪৭ নম্বর খাতা অবধি যে আমি উদ্ধার করেছি তাতেও ভূমেন্দ্র গুহ আছেন। কীভাবে জীবনানন্দ দাশের লেখার ধরন চিনতে হয়, কীভাবে অনেক বিকল্পর মধ্যে একটি শব্দকে নির্বাচন করতে হয় এবং কীভাবে বাদ দেওয়া পংক্তিগুলোকে চিহ্নিত করতে হয় তা ভূমেন্দ্র গুহ আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন।

এই বইটি কখনওই প্রকাশ পেত না যদি না প্রকাশক সন্দীপ নায়কের সক্রিয় ভূমিকা থাকত। এত বড়ো একটা প্রজেক্ট নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি যে সাহস ও ঝুঁকি নিয়েছেন তার

জন্য আগামীদিনের পাঠকদের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতার পংক্তি দিয়ে ভূমিকা শেষ করছি:

'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিলো
তা'রা ম'রে গেছে;
প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে;
তবু তা'রা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হ'য়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে
যথন প্রেমের কথা বলে
অথবা জ্ঞানের কথা
অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়
দীপংকর শ্রীজ্ঞানের;
চলেছে চলেছে

একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিলো ব'লে ভেবেছিলো।
একদিন ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান থাকে তাকে।
একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হ'য়ে তবু কেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিলো প্রণয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠে!

চেয়েছিলো
পেয়েছিলো শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে
সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে;
সিঁড়ি উদ্ভাসিত ক'রে রোদ;
সিঁড়ি ধ'রে ওপরে ওঠার পথে আরেক রকম
বাতাস ও আলোকের আসা-যাওয়া স্থির ক'রে কি অসাধারণ
প্রেমের প্রয়াণ? তবু এই শেষ অনিমেষ পথে
দেখেছে সে কোনো এক মহীয়সী আর তার শিশু;
দু-জনেই মৃত।
অথবা কেউ কি নেই!